

প্রতিবন্ধীদের স্কুলটি নিজেই প্রতিবন্ধী

গৌরী নন্দী, খুলনা ৮

শিশুটির বয়স ১৮। কিন্তু পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর বাড়লেও মস্তিষ্কের বিকাশ যথায়থভাবে ঘটেনি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের শিশুদের বলা হয় বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী। শিশুটি পড়ে যে স্কুলে, সেখানে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা আক্রান্ত শিশুরা পড়ছে। এমনকি চারজন শিক্ষিকাও শারীরিকভাবে স্বাভাবিক নন।

বিস্ময়কর হচ্ছে, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা দেওয়ার স্কুলটিও স্বাভাবিকভাবে চলছে না। হাজারো সমস্যা ঘিরে আছে প্রতিষ্ঠানটিকে। প্রতিবন্ধীদের

শিক্ষাদানের জন্য গড়ে ওঠা স্কুলটি নিজেই যেন প্রতিবন্ধী।

খুলনার ফুলতলা উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলটির নাম দামোদর

শীতপাশারডাঙ্গা প্রতিবন্ধী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রতিবন্ধী একজন মানুষের উদ্যোগে প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়া শেখানোর লক্ষ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দা অজয় দাশ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০ শতক জমি দেন। ওই জমিতেই একটি দোচালা টিনের চাউনি এবং বাঁশের বেতি দিয়ে তৈরি চাঁচের বেড়া দেওয়া ঘরেই চলে স্কুলের কার্যক্রম। আছে ১৩৮ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ২৩ জন প্রতিবন্ধী। প্রতিবছর সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। আর কোনো সহায়তা নেই। আছেন চারজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষিকা; তারা কোনো বেতন-ভাতা পান না। ২০১১ সাল থেকে বিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।

২০০৮ সালে স্কুলটির যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে এমন একটি সংগঠন সহায়তা করত। শিক্ষিকাদের জন্য তারা মাসে ৫০০ টাকা ভাতা দিত। ২০১২ সাল থেকে এ সহায়তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শিক্ষিকারা স্কুলে রয়ে গেছেন। ওই সময়ে কোন রেজিস্টার্ড প্রাইমারি স্কুল থাকবে না, সবই সরকারি করা হবে; প্রধানমন্ত্রীর এমন ঘোষণায় স্কুল কর্তৃপক্ষ সাইনবোর্ড পাল্টে তাতে সরকারি লিখে দেয়। যে কেউ দেখলেই বুঝবে এটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু না, সাইনবোর্ডে পরিবর্তন হলেও স্কুলটিতে সরকারি কোনো সহায়তা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খুলনা শহর থেকে খুলনা-যশোর

মহাসড়ক ধরে যশোরের দিকে ১৫ কিলোমিটার গেলে ফুলতলা উপজেলা কার্যালয়। উপজেলা ক্যান্সাসের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া সড়ক ধরে এগিয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার পিচঢালা আঁকাবাঁকা পথে পূর্ব দিকে গেলেই রাস্তার পাশে চোখে পড়ে শীতপাশারডাঙ্গার এ স্কুলটি। সামনে বিশাল একটি খেলার মাঠ। মাঠের ঠিক পশ্চিম প্রান্তে জরাজীর্ণ বিদ্যালয় ঘরটি। এতে আছে চারটি শ্রেণিকক্ষ, যাতে ঠিকমতো আলো ঢোকে না। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে শিশুদের পাঠদান হয়। যদিও কক্ষে বৈদ্যুতিক

বাতি ও পাখা দুই-ই আছে। কিন্তু এগুলো তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না।

শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করেই এই প্রতিবেদক আলো-আঁধারির এক ঘোরের মধ্যে পড়েন। কোনো শিশুর মুখ ঠিকমতো নজরে আসে না। শ্রেণি শিক্ষক আলোর স্বল্পতা থেকে রেহাই পেতে দরজার কাছে এসে

পড়াচ্ছিলেন। শ্রেণি শিক্ষক জানান, বিদ্যুতের খরচ বাঁচাতে আলো জ্বালানো হয়নি। কারণ এই স্কুলের কোনো আয় নেই। বিদ্যুতের বিল কিভাবে পরিশোধ করা হবে!

স্কুলটির সামনেই একটি গাছ ভেঙে পড়ে মাসদুয়েক আগে। মজুরি না দিলে কেউ গাছটি সরিয়ে নেবে না বলে তা পড়ে আছে। এতে শিক্ষার্থীদের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ একটি প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলটির উত্তর পাশে একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসিয়েছে। শিক্ষিকা ইয়াসমিন আরা বলেন, 'স্কুলটি শুরু হওয়ার সময় একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে মাসে ৫০০ টাকা ভাতা দিত। ২০১২ সালের পর থেকে তা বন্ধ হয়ে যায়।'

অন্য এক শিক্ষিকা সালমা আক্তার বলেন, 'প্রতিদিন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্কুলে আসি। শিক্ষার্থীদের পড়াই। আবার সময় শেষ হলে বাড়ি যাই। কোনো বেতন-ভাতা পাই না; আদৌ পাব কি না, জানি না।'

শিক্ষিকা জোহরা সুলতানা বলেন, '২০১৩ সালে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের সব বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। সেই থেকে বিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডে সরকারি শব্দটি লেখা হয়েছে। কিন্তু তিন-বছর কেটে গেলেও সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা আমরা পাই না।'

প্রতিবছর
সরকারের পক্ষ
থেকে শিক্ষার্থীদের
পাঠ্যপুস্তক
দেওয়া হলেও
আর কোনো
সহায়তা নেই